শুধু কংসমামা নয়, বিদেশি পণ্ডিতরাও

কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত আসলে বাইবেল থেকে নেওয়া, এমন একটা ধারণা প্রচার করতে ব্রিটিশ আমলে নানা গবেষক তৎপর হয়েছিলেন। জন্মাষ্টমী নিয়ে ঝঞ্ঝাটের শেষ নেই।

জহর সরকার

২৫ অগস্ট, ২০১৬, ০০:০০:৪০

জন্মাষ্টমী একটি প্রতিযোগিতার নাম। ভুবনেশ্বর, ২০১২

ধর্মবিশ্বাসী হোন বা নাস্তিক, পণ্ডিতদের কাছে কৃষ্ণের আকর্ষণ বরাবরই অত্যন্ত প্রবল, তবে তাঁকে নিয়ে সবচেয়ে ঝঞ্ঝাট হল ইতিহাসবিদদের। লোকবিশ্বাস যা-ই হোক না কেন, বেদে কোথাও কৃষ্ণের দেখা মেলে না, অনেক চেষ্টাচরিত্র করে তাঁর প্রথম নির্ভরযোগ্য উল্লেখ পাই খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর ছান্দোগ্য উপনিষদে। আরও পরের তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও তাঁর কথা আছে, তবে তাঁর আশ্চর্য জন্মকাহিনির নামগন্ধ নেই সেখানে। সে বৃত্তান্তের জন্য অপেক্ষা করতে হবে খ্রিস্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতকের বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ পর্যন্ত।

এর মধ্যবর্তী কিছু পুরাণে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, কিন্তু পরের যুগে এক জন মস্ত বড় দেবতা হিসেবে তাঁর যে প্রতিপত্তি, সেটা পুরনো আমলের সৃষ্টিগুলিতে নেই। অনেকগুলো শতক ধরে কৃষ্ণের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছেন বসুদেব এবং বলরাম-সঙ্কর্ষণ। মোটামুটি চতুর্থ শতাব্দী অর্থাৎ গুপ্তযুগ অবধি কৃষ্ণকে তাঁদের সঙ্গী বা শরিক হিসেবেই দেখি। মহাভারত এবং গীতা যখন তাদের পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল, তত দিনে, প্রতিদ্বন্দ্বী শৈবধর্মের বৈষ্ণব প্রতিস্পর্ধী রূপে, কৃষ্ণ বিপুল মহিমা অর্জন করেছেন। বসুদেব এবং বলরাম, দু'জনকেই তিনি ইতিমধ্যে নিজের কাহিনির অংশ করে নিয়েছেন। গুপ্তযুগের এবং তার পরবর্তী ভাস্কর্যে কৃষ্ণের বাল্যলীলার বিস্তর ছবি মেলে। যমুনার তীরে পশুচারণ-ভিত্তিক যে নতুন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, এই সব দৃশ্যে কৃষ্ণ তারই প্রতিমূর্তি। সমাজের মানুষজনকে তুমুল বর্ষণ থেকে বাঁচাতে কৃষ্ণ গিরিগোবর্ধন হাতে তুলে ছাতার মতো ধরে আছেন— ডি ডি কোসাম্বী বা ইয়ান খোন্ডা-র মতো ইতিহাসবিদদের মতে এই দৃশ্য আসলে আর্যদের সর্বশক্তিমান পর্জন্যদেবের বিরুদ্ধে তুলনায় কৃষ্ণবর্ণ মানুষদের দেবতার জয়ের সূচক।

কিন্তু তখনও জন্মাষ্টমীর বিশেষ কোনও মাহাত্ম্য তৈরি হয়নি, সে জন্য আমাদের আরও প্রায় সহস্রাব্দ অপেক্ষা করতে হবে। ঈশ্বরকে এক জন সুরসিক প্রিয়জন হিসেবে দেখার যে ধারাটি কৃষ্ণলীলায় দেখি, সেটির পিছনে সুরদাস, মীরা এবং 'ভক্তি' কবিদের বড় অবদান ছিল। তবে রাধা তখনও ত্রিসীমানায় নেই, তাঁর আসতে আসতে আরও কয়েক শতাব্দী পরের ভাগবতপুরাণ অবধি অপেক্ষা করতে হবে। শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ সম্পূর্ণ হতে হতে দ্বাদশ শতাব্দীতে পৌঁছে যাই আমরা, যখন জয়দেব রাধাকৃষ্ণের প্রেমের নিবিড় ছবি আঁকলেন, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সুরদাস শঙ্করদেবেরা মধুর প্রেমের পদাবলি ও গীতিকবিতাগুলিকে জনপ্রিয় করে তুললেন।

চতুর্থ শতকের পুরাণকাহিনিতে বালগোপালের নানান লীলার দেখা মিলতে শুরু করল। খেয়াল করা দরকার, এই সময়েই মধ্য এবং পশ্চিম এশিয়ার কিছু কিছু জনজাতির মানুষ ভারতে বসতি গড়ছিল। তাদের মধ্যে ছিল পশুচারণ-নির্ভর আভীর, গুজ্জররা, এমনকী হুনরাও। তারা ভারতের রীতিনীতি, শাস্ত্র, পুরাণ, সবই গ্রহণ করল, পাশাপাশি নিজেদের নানা লোককাহিনিও বহাল রাখল। আর জি ভাণ্ডারকর বা সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো পণ্ডিত গবেষকদের দৃঢ় ধারণা, এই 'সাংস্কৃতিক বিনিময়'-এর সূত্রেই আভীরদের কাছ থেকে বালগোপালের বৃত্তান্ত এসেছিল। তবে সংস্কৃতিতে এমন কিছু কিছু সাদৃশ্যের কারণেই ব্রিটিশ আমলে প্রবল তর্ক উঠেছিল। তর্কের শুরু ১৮৭৪ সালে, যখন আলব্রেখ্‌ট হেবার-এর অ্যান ইনভেস্টিগেশন ইনটু দি অরিজিন অব কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বইটি প্রকাশিত হয়। তাঁর মতে, যিশুখ্রিস্টের মতোই কৃষ্ণও পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরপ্রেরিত, দু'জনেরই জন্ম হয়েছিল ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে। যিশু ভূমিষ্ঠ হন জীর্ণ আস্তাবলে, নানা প্রাণীর মধ্যে। কৃষ্ণের জন্ম কারাগারের অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে কুঠুরিতে। দু'জনেই পশুপালক গোষ্ঠীর মধ্যে বড় হন— যিশু মেষপালকদের সমাজে, কৃষ্ণ গোপালকদের পল্লিতে। যিশুকে হত্যা করতে তৎপর হন নিষ্ঠুর রাজা হেরড, ঠিক যেমন কৃষ্ণকে ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লাগেন রাজা কংস।

এই তুলনার সূত্র ধরে ব্রিটিশ আমলে পণ্ডিতরা বিস্তর ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিতে থাকেন। জেমস কেনেডি বা নিকোলাস ম্যাকনিকল-এর মতো গবেষকরা তো নিশ্চিত ছিলেন যে, খ্রিস্টীয় কাহিনি থেকেই জন্মাষ্টমীর উদ্ভব। ১৮৯৫ সালে এডওয়ার্ড হপকিন্‌স ঘোষণাই করে ফেলেন যে কৃষ্ণের জন্মের গোটা কাহিনিটা বাইবেল থেকে নেওয়া। আর স্টিভেন রোসেন দাবি করেন, 'হিন্দুদের অবতার-তত্ত্বের পুরো ধারণাটাই যিশুখ্রিস্টের পুনর্জন্মের ধারণা থেকে ধার করা।' লরিনসার খুব প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন যে, 'ভগবদ্গীতা আসলে নিউ টেস্টামেন্ট-এর কিছু বাতিল অংশ।'

বেচারা কৃষ্ণ! কপালটাই এমন যে, কেবল পুতনা রাক্ষসী বা কংস মামাকে মোকাবিলা করেই তাঁর দুর্ভোগের শেষ হয়নি, বিদেশি পণ্ডিতদেরও সমান তালে সামলাতে হয়েছে। আগেকার বৈদিক দেবতারা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে স্বর্গীয় বা অলৌকিক উৎসের দাবিদার হতে পেরেছেন, কিন্তু বৌদ্ধ কাহিনিতে মহামানবদের স্বর্গীয় অথচ নির্দিষ্ট জন্মবৃত্তান্ত এতটাই জনপ্রিয় হয়ে পড়ল যে, নতুন যুগের হিন্দু দেবতাদেরও জন্মানোর জন্য আশ্চর্য, অলৌকিক আখ্যান প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। আর সেই জন্যই রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের চরিত্রদের জন্ম পৃথিবীতে, কিন্তু তাঁদের জন্মকাহিনিতে জড়িয়ে রয়েছে আপার্থিব সব ঘটনা। এই জন্যই বোধ হয়, জন্মের একটি সময় বা তারিখের প্রয়োজন হয়, সেই সময় নিয়ে তর্ক থাকলেও, যেমনটা রয়েছে গৌতম বুদ্ধের ক্ষেত্রে। দু'হাজার বছর ধরে বহু গবেষণা ও তর্কবিতর্কের পরেও যিশুর জন্মের তারিখ নিয়ে নানা মত থেকে গিয়েছে— ২৪ ডিসেম্বর থেকে ৬ জানুয়ারি বা তারও কিছু পরেও খ্রিস্টমাস মানা হয়। ধর্ম কেবল বিশ্বাস আর আচারের ব্যাপার নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নানা উৎসবও। আর সে-কালের মানুষজন এখনকার স্কুলগুলোর মতো দেবতার বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতেন না।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিটি বাইরে আনন্দ করার পক্ষে খুব একটা উপযোগী নয়, এ সময় বড় বেশি বৃষ্টিবাদলা হয়। তা সত্ত্বেও বহু মানুষ বৃষ্টি মাথায় করেই কৃষ্ণের মন্দিরে যান। সারা ভারতেই বহু মন্দির ছড়িয়ে আছে: মথুরা বৃন্দাবন দ্বারকা পুরী নবদ্বীপ গুরুভায়ুর উডুপি কাঞ্চীপুরম ইম্ফল, এবং অসমের নামঘরের মতো বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠানগুলি। অনেক সময়েই প্রেমিক তরুণ কৃষ্ণের রাসলীলার মধ্যে দিয়ে তাঁর জন্মোৎসব পালন করা যায়। দেশের অনেক জায়গায় ভক্তরা সারা দিন উপবাসে থেকে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন এবং প্রসাদ ও নানা সুখাদ্য সহযোগে মধ্যরাত্রে কৃষ্ণজন্মের উৎসব পালন করেন। তামিলরা তাঁদের বাড়ির সামনে ছোট ছোট পায়ের ছাপ আঁকেন— বালকৃষ্ণের পদচিহ্ন, ঠিক যেমন বাঙালিরা বাড়ির সামনে লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আঁকেন। মা লক্ষ্মী অবশ্য সে দিকে বিশেষ পাত্তা দেন না।

এই গোকুল-অষ্টমীতে মহারাষ্ট্রের মানুষ তারুণ্যে ভরপুর 'গোবিন্দ'দের জন্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। গোবিন্দরা এক একটা দল গড়ে, এক দল আর এক দলের কাঁধে চড়তে থাকে, এ-রকম ভাবে মানব-পিরামিড বানায় তারা, চার-পাঁচ তলা অবধি ওঠে সেই পিরামিড। যারা অনেক উঁচুতে রাখা 'বালগোবিন্দ'-এর ননীভাণ্ডটিতে পৌঁছে সেই মৃৎপাত্র ফাটাতে পারে, তারা

অনেক টাকা পুরস্কার পায়। তামিলদেরও এ-রকম একটি অনুষ্ঠান আছে, তার নাম ‘উরিয়াড়ি’। এই সব খেলা অলিম্পিকে ঠাঁই পেলে ভারতীয় পুরুষরাও দু’একখানা সোনা জিতে আনতে পারত!

প্রসার ভারতী-র সিইও, মতামত ব্যক্তিগত